প্রধানমন্ত্রী
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের রায়

৫ বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগের অনেক সাফল্য হারিয়ে গেছে তাদের কয়েকজন সন্ত্রাসী নেতার কারণে। বিভিন্ন সময়ে সাপ্তাহিক ২০০০ ও অন্যান্য পত্রিকা এ বিষয়ে একাধিক লেখা প্রকাশ করেছিল, টনক নড়েনি নেত্রীর। হয়ত এখনও তার বোধোদয় হয়নি। এটাই আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতাই সাফল্য এনে দিয়েছে চারদলীয় জোটকে ... লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

এক কথায় বলা যায় বিস্ময়কর। তারপরও হয়ত পুরোটা বলা হয় না। আবার অন্যভাবে বলা যায় ধারণাটা তো অমূলক ছিল না। তাহলে অমূলক না থাকার পরও বিস্ময়কর কেন? আসলে নির্বাচনী ফলাফলের হিসেবের সঙ্গে 'যদি' শব্দটি খুব জোর দিয়ে থাকে। এবারের বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলের আগাম হিসেবে এই 'যদি'র প্রভাব ছিল অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কারণ বিএনপি জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টিকে (না-ফি) সঙ্গে নিয়ে জোট করেছিল। নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগ মহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না এই জোট কতটা দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন করতে পারবে। জামায়াতের ভোট শেষ পর্যন্ত বিএনপি বা জাতীয় পার্টি (না-ফি) পাবে কিনা, বিএনপি'র ভোট জামায়াত পাবে কিনা এরকম সন্দেহ ছিল প্রবলভাবে। জোটগতভাবে ভোট বাড়লে এমন ফলাফল অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে এই জোটগতভাবে নির্বাচন করাই কী বিএনপি'র বিজয়ের মূল কারণ? প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই 'না'। জোটগতভাবে নির্বাচন করে বিএনপি কিছুটা সুবিধা পেয়েছে একথা সত্যি। কিন্তু বিএনপি'র চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছে জামায়াত।

বিএনপি'র এই বিস্ময়কর ফলাফলের পেছনে আরো কিছু বিষয় কাজ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম খালেদা জিয়ার ব্যক্তি ইমেজ। খালেদা জিয়া এবার নির্বাচনী প্রচারণায় অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ার পরও শেখ হাসিনার চেয়ে নির্বাচনী সফর করেছেন বেশি। এমনও দিন গেছে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০ ঘন্টা

আবারও হাস্যকর অভিযোগ : এবার সূক্ষ্ম নয় স্থূল কারচুপির অভিযোগ এনেছেন ব্যর্থ নেত্রী শেখ হাসিনা। ছবিতে : শেখ হাসিনার পাশে আব্দুস সামাদ আজাদ ও হাজী সেলিম

নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেছেন। সারারাত ধরে বক্তৃতা করেছেন বিভিন্ন পথসভা বা জনসভায়। খালেদা জিয়ার এই নির্বাচনী প্রচারণা বা বক্তৃতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মার্জিত বক্তব্য। শেখ হাসিনা মূলত খালেদা জিয়ার কাছে পিছিয়ে পড়েছেন এখানেই। কী এক অদ্ভুত কারণে শেখ হাসিনা ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে পছন্দ করেন। যেমন সপ্তম জাতীয় সংসদের সমাপনী বক্তৃতায় শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে 'নিশিকুটুম্ব' বলেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির ঐতিহ্য বলে খালেদা জিয়া আরো কটু ভাষায় শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে খালেদা জিয়া নিজে এই আক্রমণের কোনো জবাব দেননি। বরিশালের নির্বাচনী জনসভায় শেখ হাসিনা মিটিমিটি হাসতে হাসতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান লতিফুর রহমানের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানকে রাষ্ট্রপতি না কোনো পতি বানাতে চান আল্লাই জানে।'

শেখ হাসিনার এই বক্তৃতায় তার ক্যাডার, নেতা, পাতি নেতারা হাতে তালি দিয়েছেন। হাসিনা তাতে আরো উৎসাহ পেয়েছেন। লাগামছাড়া কথা বলা রেখেছেন অব্যহত। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন সাধারণ মানুষের কথা, ভোটারের কথা। যারা অশ্লীলতা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ পছন্দ করেন না। তারা অন্তত শেখ হাসিনার মতো নেত্রীর মুখ থেকে এমন অশ্লীল কথা শুনতে চায় না। খালেদা জিয়ারও বলার ছিল অনেক কিছু। তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে ওয়াজেদ মিয়ার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে পারতেন। কথা বলতে পারতেন ডা. ইকবালের সঙ্গে শেখ রেহানার সম্পর্ক নিয়েও। খালেদা জিয়া এসবের কোনো কিছুই না করায় সাধারণ ভোটারদের সহানুভূতি গেছে তার দিকে।

তবে বিএনপি'র এই বিজয়ের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অন্য একটি বিষয়। সেটা হলো সন্ত্রাস। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৩ অক্টোবর ২০০০-এর সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রচ্ছদে এনেছিলাম আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে। জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান এবং আবু তাহের। এই তিনজনকে আমরা উল্লেখ করেছিলাম 'হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' নামে। আমরা খুব জোর দিয়ে বলেছিলাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবরূপী এই সন্ত্রাসীরা শেখ হাসিনার ধ্বংস ডেকে আনবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রায় সব পত্রিকা একথা লিখেছিল। এমন নয় যে সব পত্রিকা বা সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগ বিরোধী ছিল। বরং আওয়ামী লীগের পক্ষের সাংবাদিকরাই সন্ত্রাসের বিষয়টি নিয়ে বেশি লিখেছেন। তারা লিখেছেন আওয়ামী লীগের ভালোর জন্য। কিন্তু শেখ হাসিনা এ কথায় কান দেননি। কান দিয়েছেন এক শ্রেণীর তোষামোদকারী কলামিস্টদের লেখায়। তারা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শেখ হাসিনাকে বিভ্রান্ত করেছে। এখন এই তোষামোদকারীরা কারচুপির অভিযোগ এনেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দোষ চাপাবে। এতেও যদি শেখ হাসিনা বিভ্রান্ত হন তাহলে সেটা হবে আর একটা ভুল। জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমানদের সন্ত্রাসের সামনে সাধারণ মানুষ ছিল অসহায়। নির্যাতিতদের কেউ কেউ ছুটে গেছে শেখ হাসিনার কাছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সন্ত্রাসের বিচার তো হয়ইনি, উল্টো নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে।

মানুষ অপেক্ষায় ছিল নির্বাচনের। মানুষের মনের ইচ্ছের কিছুটা তারা পূরণ করেছে আওয়ামী লীগে ভোট না দিয়ে। পরাজিত হয়েছে এই সন্ত্রাসের দানবরা। কিন্তু এই পরাজয় কী শুধু সন্ত্রাসীর পরাজয়? না, হাজারী বা শামীম ওসমানের পরাজয় নয়। এই পরাজয় আসলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পরাজয়। শেখ হাসিনার পরাজয়। গত পাঁচ বছরের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাফল্য খুব কম ছিল না।

সাপ্তাহিক ২০০০ একাধিকবার প্রচ্ছদ কাহিনী, প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল সন্ত্রাসী গডফাদারদের নিয়ে। আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, তাহের, মকবুল, ইকবালের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। মানুষ নিশ্চুপ থেকে দেখেছে। আর দেখিয়ে দিয়েছে ভোট দিয়ে

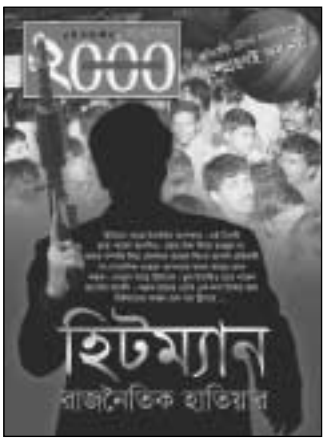

একের পর এক খুনের পরও কোনো তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি। মানুষ প্রতিবাদ রাজপথে করেনি, করেছে ব্যালট পেপারে

গণভবন দখল হাসিনার ইমেজে ধ্বস নামিয়ে দেয়

উল্লেখ করার মতো ছিল অনেক কিছুই।

ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তির মতো জটিল সমস্যার সমাধান করেছিল তারা। যদিও চুক্তি অনুযায়ী হয়ত বাংলাদেশ ঠিক মতো পানি পায়নি। তারপরও আওয়ামী লীগের প্রশংসা করতে হবে, কারণ তারা প্রক্রিয়াটা শুরু করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সমস্যারও সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্যে যে উদ্যোগ এবং সততার প্রয়োজন ছিল সেটা আওয়ামী লীগের মধ্যে দেখা যায়নি। চুক্তি করেছে কিন্তু বাস্তবায়ন করেনি। চুক্তি করে হাসানাত আবদুল্লাহর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে, শেখ হাসিনা পদক পেয়েছেন– কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসেনি। আর এরকম একটি অসফল বিষয়কে পুঁজি করে নির্বাচনে জিততে চেয়েছিল হাসানাত আবদুল্লাহ। চুক্তি যেমন সফল হয়নি, হাসনাত আবদুল্লাহর উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। মানুষ তার ছলচাতুরি ধরে ফেলেছে। তার এবং তার পুত্রদের সন্ত্রাসের কথা মানুষ ভুলতে পারেনি। সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের সবকিছুকে তছনছ করে দিয়েছে।

সন্ত্রাস বাংলাদেশে সব সময়ই ছিল। বিগত খালেদা জিয়া সরকারের সময়ে ছিল। ছিল এরশাদ, জিয়া বা তার আগেও। তবে গত পাঁচ বছরের সন্ত্রাস ছিল অন্য সব সময়ের সন্ত্রাসের চেয়ে ব্যতিক্রম। সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রীয় সাপোর্ট দেয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনোই ঘটেনি। পূর্বে সন্ত্রাসীরা কাজ করতো রাজনীতিবিদদের ভাড়াটে হিসেবে। আর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদরাই হয়ে পড়েছে সন্ত্রাসী। যথারীতি সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ হাসিনার আত্মীয় আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। মায়া, কামাল মজুমদার, শামীম ওসমান, মকবুল, ইকবালরা সন্ত্রাসকে দিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। যার পেছনে শেখ হাসিনার সাপোর্ট ছিল স্পষ্ট। হাজী সেলিম প্রায় একাই বুড়িগঙ্গার অর্ধেক দখল করে ফেলেছেন। পিছিয়ে ছিলেন না এদের পুত্ররাও। মায়ার পুত্র দিপু চৌধুরী চাঁদাবাজি থেকে দখল সবই করেছেন। মানুষ খুন করাও বাদ রাখেননি। তারাজ হত্যাকান্ডের অভিযোগ ছিল দিপুর বিরুদ্ধে। দিপুর বাবা-মা নিজে তারাজের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে মামলা থেকে দিপুর নাম বাদ দিয়েছেন। তারাজের অসহায় আত্মীয়-পরিজন মামলা থেকে দিপুর নাম বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাদের স্বজন হারানোর হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে দেশ জুড়ে। সেই হাহাকারে ভস্ম হয়ে গেছে মায়া, আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের কামাল মজুমদারের ছেলে জুয়েল নিরীহ ব্যবসায়ী শিপুকে হত্যা করেছে প্রকাশ্যে। শেখ হাসিনার সরকার সেই হত্যার বিচার করেনি। মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছে কামাল মজুমদারের প্রতি, আওয়ামী লীগের প্রতি। ব্যালট পেপারে সিল মারতে গিয়ে ভোটারের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ইকবালের সেই ছবি। যে ছবিতে দেখা যায় ইকবালের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা গুলি করে মানুষ মারছে। তখন নৌকার ভোটও চলে গেছে ধানের শীষে। এখানে বিজয়ের ক্ষেত্রে বিএনপি প্রার্থী মান্নানের কৃতিত্ব খুবই কম।

অসংখ্য মায়ের বুক খালি করা কুখ্যাত সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারীর পক্ষে কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। ফেনীতে জনসভা করতে গিয়ে হাসিনা বলেছেন, 'জয়নাল হাজারী আছে, থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনি আর কয়দিন?'

মাননীয় নেত্রী, আপনার কথা পুরোপুরি সঠিক। জয়নাল হাজারী আছে এবং থাকবে। নির্বাচিত হতে না পারলেও হাজারীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে এটাও আমরা জানি। সন্ত্রাস এবং চোরাচালানের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া হাজারীরা সব সময়ই টিকে থাকে। সন্ত্রাসীদের দিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করিয়ে মানুষ মারলেও ইকবাল, শামীম ওসমান, তাহেররা আপনার সমর্থন পায়। আর আপনাদের মতো রাজনীতিবিদদের সাপোর্ট পায় বলেই হাজারীরা টিকে থাকে। কিন্তু প্রিয় নেত্রী, আপনারা ভুলে যান আপনাদের অবস্থানের কথা। আজ আপনার অবস্থান কোথায়? আপনার তো থাকার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী। নিজের লজ্জা ঢাকতে হাজারীদের বাঁচাতে আজ আপনাকে রাজপথে দাড়িয়ে কারচুপির হাস্যকর অভিযোগ করতে হচ্ছে! এটাই ট্র্যাজেডি। এটাই নিয়তির নির্মম পরিহাস। যখন আপনার শাসনামলে প্রতিদিন দেশে গড়ে ৯ জন মানুষ খুন হয়েছে আপনি সেটা দেখেও না দেখার ভান করেছেন। যদি সেটা দেখতেন, হত্যাকান্ডের বিচার করতেন, তাহলে আপনার লোকজন সন্ত্রাস করতে সাহস করতো না। আর আজকের এই পরিণতিও বরণ করতে হতো না আপনাকে।

'৯৬-এ লজ্জাজনকভাবে পতন হয়েছিল বিএনপি সরকারের। 'দেখিয়ে দিলাম' মানসিকতায় আওয়ামী লীগ গত পাঁচ বছরে ভোগ করেছে সেই সুফল। বিএনপির মতো আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়নি। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের গর্বের শেষ ছিল না। এটা গর্ব করার মতো বিষয়ও। শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে এত ভালোভাবে বিদায় নিতে পারেনি অতীতের কোনো সরকারই, এবার যা পেরেছিল আওয়ামী লীগ। আর এটাই হয়েছে আওয়ামী লীগের জন্যে সাপেবর। অসম্ভব অহঙ্কারী হয়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারা মিডিয়া বা জনমত কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করেনি। আওয়ামী লীগের নেতারা বাংলাদেশকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করেছে। আবার ক্ষমতায় আসতে হলে যে মানুষের ভোট পেতে হবে এটা তারা মনে রাখেনি। যে যেভাবে পেরেছে নিজের আখের গুছিয়েছে। সবাই ভেবেছে নিজের কথা। দল বা দেশের কথা কেউ ভাবেনি। ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে অকারণে নিজেদের লোকদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়েছে। অকারণে এই জন্যে যে, আওয়ামী লীগের মতো একটি ম্যাচিউর পার্টির কাছ থেকে এমনটা আশা করা যায় না। এভাবে বদলি করলে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে রদবদল করবে এমন ধারণাকে আমলে আনেনি তারা। উল্টো ক্ষমতা ছেড়ে এসেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শ্লীল-অশ্লীল ভাষায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করেছে আওয়ামী লীগ। এমন কী আওয়ামী লীগ নেতা শাহ এ এস এম কিবরিয়া হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন ক্ষমতায় গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয় বিবেচনা করবেন। শেখ হাসিনা একদিকে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলছেন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার আবিষ্কার বলে। অন্যদিকে সেই সরকারের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছেন। এগুলো সাধারণ মানুষ পছন্দ করেনি। হুমকি দিলে মানুষ তখনি হয়ত কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মানুষ এটাকে ভালোভাবেও নেয় না। সুযোগ পেলেই মানুষ তাদের মনোভাবকে প্রকাশ করে। যেমন করেছে নির্বাচনের মাধ্যমে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং বোমা বিস্ফোরণ পরিণত হয়েছিল নিয়মিত বিষয়ে। ক্ষমতায় থেকে এসবের কোনোটার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়নি আওয়ামী লীগ। অথচ ক্ষমতা থেকে গিয়েই সন্ত্রাসের জন্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দায়ী করতে থাকে। এক কথায় তারা বিএনপিকে বাদ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকে। সাধারণ ভোটাররা এটাকেও খুব ভালোভাবে নেয়নি। মানুষ আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টির ওপরেই বিরক্ত। যখন যারা ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের ওপর বিরক্তির মাত্রাটা বেশি থাকে। এই কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব রকম কাজকেই মানুষ সমর্থন করে। দায়িত্ব নেয়ার রাতেই ১৩ জন সচিবের বদলি করা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে, এত তাড়াহুড়ো করার কী প্রয়োজন ছিল? বা এত রদবদলেরই বা কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু এ বিষয়গুলো নিয়ে যদি ভোট নেয়া হয় তাহলে সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষেই যাবে– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রমাণ করেছে যে, তাদের কার্যক্রম সঠিক ছিল। নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে যেটা প্রমাণ হয়েছে। নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ না হতো, নির্বাচনের দিনে যদি ব্যাপক সহিংসতা দেখা দিত তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবমূর্তি নিয়ে সত্যি সত্যি প্রশ্ন দেখা দিত। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের প্রধান যে দায়িত্ব সেটা পালন করেছে অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে। আজকে আওয়ামী লীগ বিচারপতি লতিফুর রহমানের যত সমালোচনাই করুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। এমন দিন আসবে যেদিন আওয়ামী লীগেরও প্রশংসা করতে হবে লতিফুর রহমানকে। '৯১ সালে পরাজিত হয়ে শেখ হাসিনা বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেই হাসিনার মুখে এখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সবচেয়ে বেশি প্রশংসা শোনা যায়। আর অন্য দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থান ইতিহাসে ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। কারণ লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অন্যদের তুলনায় প্রতিকূল অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এবং তারা সফল এবং যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছে।

এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে

রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগের সময়ে বিশ্বের দুর্নীতিবাজ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থান পেয়েছিল। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে

আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কথা বলার অধিকার আছে কিনা সেটাও তাদের ভেবে দেখা উচিত। কারণ এই রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার কারণেই উদ্ভব হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। যে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা নেই একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার, তাদের সমালোচনা করার অধিকারও থাকা উচিত নয়।

বিএনপি বা চারদলের নেতৃত্বে সরকার গঠন করাটা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। খালেদা জিয়া হবেন যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

আগামী সরকারের শরিক দল হবে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট। এই দুটি রাজনৈতিক দলেরই পরিচিতি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে। তবে এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশের একশ্রেণীর লোক প্রগতিশীল 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ও 'রাজাকার' বিষয়টিকে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন, রাজাকারদের বিচারের কথা বলেন, কিন্তু তার মধ্যে সততা থাকে না, থাকে অসৎ উদ্দেশ্য। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যটা মানুষ বুঝে ফেলেছে। এই কারণে মানুষ এখন আর তাদের কথা বিশ্বাস করে না। এই কারণে তারা যখন পাবনায় গিয়ে যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে সমাবেশ করে, তখন মানুষ পাওয়া যায় না। নিজামীকে ভোট দিতে নিষেধ করার পরও মানুষ নিজামীকেই ভোট দেয়। এর কারণ কী? পাবনার ঐ আসনের সব মানুষ কী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের? এমনটা ভাবার কী কোনো যৌক্তিক কারণ আছে? নেই। মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পরিবর্তন চেয়েছে। কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর কে বিপক্ষের সেটা দেখেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে যারা জয়নাল হাজারীর মতো সন্ত্রাসীদের পক্ষে কথা বলে মানুষ আর যাই হোক তাদের কথার গুরুত্ব দেয়ার কারণ খুঁজে পায় না।

তারপরও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির প্রতি মানুষের একটা বিরূপ মনোভাব আছে। এটা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। বিএনপি সরকারে এদের ভূমিকা কী হয় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপির জন্যে আশার কথা হলো তারা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ফলে জামায়াত বিএনপিকে নিয়ে খেলতে পারবে না। সরকার গঠনে এরশাদের মতো ধুরন্ধর স্বৈরাচারের ভূমিকাও নগণ্য হয়ে গেছে। এটাও বাংলাদেশের রাজনীতির জন্যে একটি শুভ লক্ষণ। বিএনপি যদি শুরু থেকেই জামায়াতকে খুব বেশি বাড়তে না দেয়ার মানসিকতা নিয়ে আগায় তাহলে সেটা খুবই ভালো হবে। কারণ জামায়াতকে একবার আশকারা দিয়ে দিলে তারা মাথায় উঠে যেতে পারে। তখন বিএনপি বিরোধী মানসিকতা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই সরকারকে, খালেদা জিয়াকে একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে। সেটা হলো আজকে বিএনপি'র যে বিজয় হয়েছে সেটা শুধু বিএনপি'র কারণে হয়নি। বিজয় হয়েছে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণে। হাজী সেলিম, ইকবাল বা জয়নাল হাজারীদের ওপর মানুষ এতটাই বিরক্ত ছিল যে তাদেরকে মানুষ এতটাই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল যে, বিএনপি থেকে যাকে দাঁড় করানো হয়েছে মানুষ তাকেই ভোট দিয়েছে। মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রবল ঘৃণা তৈরি হওয়ার কারণেই সন্ত্রাস না করেও ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত সাবের চৌধুরীরাও পরাজিত হয়েছেন। এক সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা আরেক সন্ত্রাসীকে ভোট দিয়েছে। আসলে জনগণের সামনে খুব বেশি পথও খোলা নেই। বিএনপি'র এটা মনে রাখতে হবে যে পিন্টু বা ভিপি জয়নালের পরিচিতি হাজী সেলিম বা জয়নাল হাজারীর চেয়ে আলাদা নয়। খালেদা জিয়াকে এমন ভূমিকা নিতে হবে তারা যেন শুধরে নেয়, রাষ্ট্রীয় সাপোর্ট পেয়ে কোনোভাবেই পিন্টুরা যেন এক এক জন হাজী সেলিম হয়ে ওঠার সুযোগ না পায়। কারণ পাঁচ বছর পর মানুষের কাছে আবার ভোট চাইতে যেতে হবে। তখন যেন মানুষ কথা এবং কাজে মিল খুঁজে পায়।

আমরা আশাবাদী বিগত ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাবে। যেখানে থাকবে না, দুর্নীতি সন্ত্রাস। এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।